The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp.119 - 130)
Published in February, 2025

পঞ্চ মহাযজ্ঞ: সনাতনী সমাজব্যবস্থায় ঋণমুক্তির বিধান

রাজপতি দাশ *

প্রতিপাদ্যসার : মোক্ষই জীবের পরম লক্ষ্য। বেদানুগ ষড়দর্শনের প্রতিটি দর্শনই ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ -এই বর্গচতুষ্টয়ের মধ্যে মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ হিসেবে স্বীকার করেছে। কিন্তু জীবের ইহজাগতিক ঋণগ্রস্থতা পারলৌকিক এই মোক্ষপথের অন্তরায়। মানুষ কয়েক প্রকার ঋণে আবদ্ধ হয়েই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর ক্রমে সেই ঋণের প্রকার আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পার্থিব এ ঋণ মৃত্যুর পূর্বে পরিশোধ করতে না পারলে মানুষের দেহান্তে মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। তাই প্রতিটি মানুষকেই জীবন ব্যাপিয়া এই ঋণ শোধে সচেষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। এক এক প্রকারের ঋণশোধের চেষ্টার অভ্যাস হল এক একটা যজ্ঞ। কারণ এই ঋণশোধের প্রচেষ্টাহেতু মানুষ প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু উৎসর্গ বা ত্যাগ স্বীকারে ব্রতী হন। এই ত্যাগাত্মক কর্মই যজ্ঞ। তাই জগতস্রষ্টা এবং তাঁরই সৃষ্টিলীলার অংশরূপ বিভিন্ন দেব-দেবতার পাশাপাশি দুর্লভ মানবজন্মদাতা পিতামাতা, জীবনপ্রবাহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সতত অবদান রেখে চলেছেন সেই ঋষি-মহাত্মাগণ, মনুষ্যাদি ইতরেতর প্রাণী প্রত্যেকের কাছে ঋণ স্বীকার করে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সাথে প্রত্যহ কোনো কিছু ত্যাগ স্বীকার করা তথা যজ্ঞ সম্পাদন করা বিধেয়। মানবজীবনে এরূপ ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সনাতন ধর্মে পাঁচ প্রকার যজ্ঞের বিধান রয়েছে, যা পঞ্চ মহাযজ্ঞ নামে অভিহিত। আলোচ্য প্রবন্ধে পারলৌকিক মুক্তির পথ সুগম করার লক্ষ্যে মানবজীবনে কীরূপে বৈদিক যুগ থেকে সনাতনী সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত এ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসরণ করে পার্থিব ঋণগ্রস্থতা থেকে মুক্তিলাভ করা যায়, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা: 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় যোগে 'ঋণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে যার অর্থ হল- পুনরায় ফিরিয়ে দেবার স্বীকৃতি দিয়ে যা গ্রহণ করা হয় তাই ঋণ- "পুনর্দেয়ত্বেন স্বীকৃত্য যৎ গৃহীতম্" (রাধাকান্তদেব ৪৯৬)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে-"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণৈঃ ঋণবান্ জায়তে" (৬/৩/১০) - অর্থাৎ জন্ম থেকেই মানুষ তিনটি ঋণযুক্ত হয়। এই ঋণগুলো হল দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ। সাংসারিক প্রপঞ্চে জীবন ধারণ করতে গিয়ে মানুষ মহাপ্রকৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তি দ্বারা প্রতিনিয়ত উপকার লাভ করে। এতে করে মানবের এ ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, দেবগণ মানুষের ভাগ্যবিধাতা; পিতৃপুরুষের পরম্পরায় মানুষ মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন; ঋষিগণ কর্তৃক প্রদেয় অপৌরুষেয় বিদ্যাই মানুষ দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছেন; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, প্রতিবেশী কিংবা সাধারণ কোনো মানুষের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষ নিয়ত সহায়তাপ্রাপ্ত হচ্ছেন; বিশ্বের সমস্ত ভূতগণের অর্থাৎ পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি যাবতীয় প্রাণীর নিকট হতে প্রতিনিয়ত মানুষ কোনো না কোনোভাবেই সাহায্য গ্রহণ করছেন। অতএব, প্রতিটি মানুষের জাগতিক জীবনব্যবস্থার সাথে মহাপ্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপ অলৌকিক দেবতা থেকে শুরু করে লৌকিক জগতের প্রতিটি জীব কিংবা বস্তুর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে জগতের লৌকিক-অলৌকিক শক্তিরাজি ও প্রাণিসকল যেহেতু একযোগে প্রতিটি মানুষের বাঁচা ও বিকাশকার্যে সহায়তাপূর্বক তাঁদেরকে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত রেখেছে, তাই প্রতিনিয়ত এসব ঋণের কথা স্মরণ রেখে এদের প্রতি প্রত্যহ শ্রদ্ধার সাথে কোনো কিছু প্রতিদান হিসেবে ত্যাগ করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। ব্যাপক অর্থে, এই ত্যাগের নামান্তরই যজ্ঞ। আর উল্লিখিত দেবতা, পিতৃগণ ও ঋষিগণের নিকট ঋণের পাশাপাশি ভূতগণ ও মনুষ্যগণের নিকট ঋণ -এই পঞ্চঋণ শোধের জন্য প্রত্যহ পাঁচপ্রকার ত্যাগাত্মক কর্মানুষ্ঠানই পঞ্চ মহাযজ্ঞ। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞই জীবের পার্থিব ঋণগ্রস্থতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়, যে উপায় অবলম্বন করে

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

জীব পরকালে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম হন। প্রাচীন আর্যসমাজে প্রত্যহ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ ভক্তিপূতহৃদয়ে ঋষিগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত হতো। বৈদিক যুগের ঋষিদের নির্লোভতা, নিঃস্বার্থতা, তপোবল, ধর্মপরয়াণতা, উদারতা তথা সর্বোপরি সর্বভূতে সমদর্শনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পঞ্চ মহাযজ্ঞরূপ এ আচার অদ্যাবধি সনাতনী সমাজব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

যজ্ঞ: প্রিয় দেবতার প্রীতি সাধনকল্পে তাঁদের উদ্দেশ্যে কোনো প্রিয়বস্তু দান করাই হল যজ্ঞ। সংস্কৃত 'যজ্' ধাতু থেকে 'যজ্ঞ' শব্দের উৎপত্তি; যার অর্থ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ পূজার অনুষ্ঠান। বৈদিক যুগে ঋষিগণ দেবতাদের অলৌকিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং জগদ্ব্যবস্থায় তাঁদের অপরিসীম অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থে দেবসন্তুষ্টি বিধানের জন্য বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে নিজেদের প্রিয়বস্তু আহুতি প্রদানের মাধ্যমে এ যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করতেন। যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী যজমানের এ যজ্ঞক্রিয়া হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা -এই চারজন বৈদিক পুরোহিতের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। যাগানুষ্ঠানের মাধ্যমে যজমানের জাগতিক অভীষ্ট যেমন সিদ্ধ হতো তেমনি যজ্ঞের মাধ্যমে মহাজাগতিক অভীষ্ট প্রাপ্তিও সম্ভব হতো। বেদে তাই যজ্ঞকে বলা হয়েছে পার্থিব এবং অপার্থিব বস্তুলাভের নিশ্চিত উপায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে- "যজ্ঞো হি শ্রেষ্ঠতমং কর্ম" (৩/২/১/৪) - অর্থাৎ, সর্বপ্রকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

বৈদিক যুগের এ সামাজিক আচারকে যজ্ঞ বলা হলেও ব্যাপকার্থে মানুষের ত্যাগাত্মক কর্মমাত্রই যজ্ঞ। মানুষের সর্বদা কর্ম করে যেতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মকেই যজ্ঞরূপে দেখতে হবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন-

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়োহ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥ (৩/৮)

এখানে অর্জুনের প্রতি যে নিয়ত কর্ম বা নিত্যকর্মের কথা বলা হয়েছে তা হলো চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কামভাবে শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত কর্ম। এখানে এও বলা হয়েছে- কর্ম না করলে শরীরযাত্রাও নির্বাহ করা যায় না। কি কৌশলে সেই শরীরযাত্রাদি নির্বাহকর্ম করতে হবে, যাতে বন্ধনের কারণ হয় না, তা পরবর্তী শ্লোকেই বিবৃত হয়েছে-

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধন।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ (৩/৯)

এখানে কর্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক- যজ্ঞার্থে কর্ম বা ঈশ্বরের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম, যা বন্ধনের কারণ নয়; দুই- যজ্ঞার্থ কর্ম ব্যতীত অন্য সকল কর্ম, যে কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। দেহ নিয়ত ব্যাপারশীল। তাই এক মূহুর্তও কর্ম না করে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই কর্ম যদি দেবতার প্রীতিসাধনের পাশাপাশি মনুষ্য থেকে শুরু করে জগতের প্রাণীকুল, উদ্ভিদ প্রভৃতির পোষণ ও বর্ধনের জন্য হয়, তাহলে সেই কর্ম যজ্ঞরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ সর্বজীবে বিরাজিত পরমাত্মার সেবার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্মই সম্পন্ন হয়, যাকে ব্রহ্মকর্ম বলে। ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলেছেন- "জ্ঞানাবস্থিত" ব্যক্তি জীবনের সমুদয় কর্ম্মই যজ্ঞময় দর্শন করেন। তাঁহার নিজ জীবনটি যজ্ঞ। বিশ্বজীবনের বিরাট কর্ম্মও ব্রহ্মাণ্ডশালার একটি মহাযজ্ঞ। যজ্ঞবুদ্ধিতে কর্ম করিতে করিতে- "যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম" (৪/২৩) ঐ সকল মহদনুভূতির উদয় হইয়া থাকে।" (মহানামব্রত ১৪৩)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নানাবিধ যজ্ঞ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> অন্যে সংযমরূপ অগ্নিতে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে হোম করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে রূপরসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করেন, ইহার নাম সংযম-যজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্য্য; অন্যে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সমূহকে আহুতি দেন-অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তিনি রাগদ্বেষশূন্যচিত্তে অনাসক্তভাবে থাকেন। মুমুক্ষু নির্লিপ্ত সংসারীরা এই যজ্ঞ করেন; ইহাকে বলা যায় ইন্দ্রিয়-যজ্ঞ। অন্য কেহ (ধ্যানযোগীগণ) সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম ও সমস্ত প্রাণকর্ম্মকে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রদীপিত আত্মসংযম বা সমাধিরূপ যোগাগ্নিতে হোম করেন অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ইহাদের সমস্তকর্ম্ম নিরোধ করিয়া আত্মানন্দসুখে মগ্ন থাকেন। ইহার নাম আত্মসংযম বা সমাধি যজ্ঞ। কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ যোগরূপ যজ্ঞ করেন, কোন কোন দৃঢ়ব্রত যতিগণ বেদভ্যাসরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ বেদার্থপরিজ্ঞানরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। আবার অন্য যোগিগণ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি প্রদান করেন, (কেহ কেহ) প্রাণে অপানের আহুতি দেন, অপর কেহ পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণ ও অপানের গতিরোধপূর্ব্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণে আহুতি দেন। (জগদীশচন্দ্র ১৫৮-১৬১, শ্লোক- ৪/২৬-২৯)

উল্লিখিত যজ্ঞগুলোর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, প্রতিটি যজ্ঞই ত্যাগাত্মক কর্ম। এদের কোনোটি দেবতা বা ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ত্যাগ, কোনোটি ইন্দ্রিয়সংযমরূপ ত্যাগ, কোনোটি আসক্তির ত্যাগ, কোনোটি বা আত্মসংযমরূপ ত্যাগ। এছাড়া দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, প্রাণায়াম-যজ্ঞ প্রভৃতি ত্যাগেরই অপূর্ব মহিমা রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে এরূপ বহুবিধ যজ্ঞ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। যেমন- হোমযাগ, ইষ্টিযাগ, সোমযাগ, সত্রযাগ, রাজকীয় যাগযজ্ঞ প্রভৃতি। অনুরূপভাবে পঞ্চ মহাযজ্ঞ নামেও বেদশাস্ত্রাদিতে পাঁচটি মহাযজ্ঞের বিধান রয়েছে যা বৈদিক সমাজব্যবস্থায় প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ হিসেবে পালন করা হতো।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ: বৈদিক যুগে আর্যঋষিগণ প্রত্যহ পাঁচ প্রকারের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন যা শাস্ত্রে পঞ্চ মহাযজ্ঞ নামে অভিহিত। এই পাঁচ প্রকার মহাযজ্ঞ হল- (১) ভূতযজ্ঞ, (২) নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ, (৩) পিতৃযজ্ঞ, (৪) দেবযজ্ঞ এবং (৫) ব্রহ্মযজ্ঞ। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে- "পঞ্চ এব মহাযজ্ঞাঃ। তান্যেব মহাসত্রাণি - ভূতযজ্ঞো, মনুষ্যযজ্ঞঃ, পিতৃযজ্ঞো, দেবযজ্ঞো, ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি" (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১/৫/৬/১)। প্রাচীন আর্যসমাজে ঋষিগণ ভক্তিপূতহৃদয়ে প্রত্যহ উক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন, যা তাঁদের নিত্যকর্ম হিসেবে পরিগণিত ছিল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে- "পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততি প্রতায়ন্তে সততি সন্তিষ্ঠন্তে দেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞঃ ইতি" (২/১০) - অর্থাৎ দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই দিনেই তার সমাপ্তি ঘটে। এ প্রসঙ্গে মনু বলেছেন-

> অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
> হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোতিথিসেবনম্॥ (মনুসংহিতা, ৩/৭০)

অর্থাৎ অধ্যাপনা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দৈবযজ্ঞ, পশুদের জন্য খাদ্যাদি প্রদান ভৌতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবা হল মনুষ্যযজ্ঞ। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে এ পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক (২/১০) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (১১/৫/৬) প্রভৃতি উত্তর বৈদিক সাহিত্যে এই মহাযজ্ঞের বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

এছাড়া মনুসংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রেও পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে এই পাঁচ প্রকার মহাযজ্ঞ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

দেবযজ্ঞ: দৈবযজ্ঞ হল দেবতার আরাধনা। আর্যঋষিগণ প্রকৃতির বক্ষে যেখানেই শক্তির বা সৌন্দর্যের উৎস আবিষ্কার করেছেন, তাঁর উপরেই দেবত্ব আরোপ করেছেন এবং তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পদে বরণ করে আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতারূপ উপহার প্রদানে পরিতুষ্ট করেছেন। সূর্যের জ্বলন্ত প্রভা, তুষারমণ্ডিত হিমালয়, উষার রক্তিমচ্ছটা, প্রখর রশ্মিপ্রদীপ্ত, নিদাঘ মধ্যাহ্ন, বেগবতী নদী, ঝড়ের প্রবল বেগ, বৃষ্টির হিতকর জল, পর্বতাকার তরঙ্গবিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, অসংখ্য তারকামণ্ডিত গগনমণ্ডলের বিচিত্র সৌন্দর্য প্রভৃতি প্রকৃতির অনন্ত গৌরব অবলোকন করে তাঁরা এসব শক্তিকে দেবতা বোধে উপাসনা করেছেন। যে কারণে বিবিধ স্তব-স্তুতির মাধ্যমে বৈদিক যুগের ঋষিগণ অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র, ত্বষ্টা, সোম, সূর্য, ঊষা, সরস্বতী, পুষা, পৃথিবী, অর্যমা, অদিতি, প্রজাপতি, পর্জন্য, মিত্র, বিশ্বকর্মা প্রভৃতিকে দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন।

প্রকৃতির অফুরন্ত নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও অনন্ত শক্তিসম্পন্ন কার্যকলাপসমূহকে অলৌকিকত্ব আরোপপূর্বক এক একটি দেবতারূপে কল্পনা করলেও তাঁরা এ সত্যও উপলব্ধি করেছেন যে প্রকৃতির প্রতিটি কার্য একই নিয়মে চালিত হয় এবং সেই মহাপ্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা একমাত্র জগদীশ্বর। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত দেবগণের কার্যসমূহ ভিন্ন নয়। তাঁদের সমবেত শক্তি, ক্ষমতা ও সামর্থ্যই সেই একক সত্ত্বাসম্পন্ন ঐশ্বরিক বল। তাই ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ক্রিয়া অনন্তরূপী জগদীশ্বরের বিভিন্ন শক্তি ও সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। বেদসংহিতার সর্বত্রই ঋষিদের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে বহুত্বের মধ্য দিয়ে একত্বের মহিমা প্রকাশ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে (১/১৬৪/৪৬) দীর্ঘতমা ঋষি বলেছেন-

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং অগ্নিমাহুঃ, অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্ ।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

অর্থাৎ- ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি ও দিব্যলোকের সুপর্ণ, সকলেই সৎ স্বরূপের প্রকাশ। ইনি এক হলেও বিদ্বানগণ একে বহু বলে বর্ণনা করেন। তাঁকেই অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে অভিহিত করেন।

অথর্ববেদেও ধ্বনিত হয়েছে নিখিল বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপ-প্রকাশক একই সুর-

স ধাতা স বিধর্তা স বায়ুর্নভ উচ্ছ্রিতম্॥
সো অর্যমা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ॥
সো অগ্নিঃ স উ সূর্যঃ স উ এব মহাযমঃ॥ (১৩/৪/১,৩-৫)

"তিনি ধাতা, তিনি বিধর্তা, তিনি বায়ু এবং তিনি ঊর্ধ্বস্থিত নভ। তিনি অর্যমা, তিনি বরুণ, তিনি রুদ্র, তিনিই মহাদেব। তিনি অগ্নি, তিনি সূর্য এবং তিনিই মহাযম।" ঋগ্বেদে সধ্রি ঋষি বলেছেন-

সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।
ছন্দাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহান্তসোমস্য মিমতে দ্বাদশ॥ (১০/১১৪/৫)

"সুপর্ণ (পরম ব্রহ্ম) একই আছেন। কবিরা তাঁকে বহুরূপে কল্পনাপূর্বক বর্ণনা করে থাকেন। তাঁরা যজ্ঞের সময় নানা ছন্দ উচ্চারণ করেন এবং দ্বাদশসংখ্যক সোমপাত্র সংস্থাপন করেন।" ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে কাণ্ব ঋষি বলেছেন-

এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবেষাঃ সর্বমিদং বিভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বম্ ॥ (৮/৫৮/২)

"এক অগ্নি বহুপ্রকার সমৃদ্ধ হয়েছেন, এক সূর্য সমস্ত বিশ্বে প্রভূত হয়েছেন। এক ঊষা এ সকলকে প্রকাশ করেছেন। এ একই সর্বপ্রকার হয়েছেন।" বিশ্বের অনন্ত কার্যপরম্পরাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে স্তুতি করা হলেও সে কার্যসমূহ যে ভিন্ন নয় অর্থাৎ সমস্ত দেবগণের মধ্যে যে একটি মহৎ প্রাণশক্তি সমাহিত তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ধ্বনিত হয়েছে ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে (৩/৫৫) ঋষি প্রজাপতির কণ্ঠে। সূক্তটির ২২টি ঋকের প্রত্যেকটিতেই শেষে উল্লেখ করা হয়েছে 'মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্'। অর্থাৎ- সমস্ত দেবগণের মধ্যে 'অসুরত্ব' তথা মহান চৈতন্যশক্তি একই। প্রচলিত অর্থে সুরবিরোধীকে অসুর বোঝানো হলেও, এখানে অসুর অর্থে প্রাণকে বোঝানো হয়েছে এবং নিখিল বিশ্বময় বিরাজিত প্রাণশক্তির মূলকেই বলা হয়েছে 'অসুরত্ব'।

আর্যঋষিগণ এভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটি মহৎ প্রাণশক্তি সমস্ত দেবতার মধ্যে সমাহিত থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছেন আর ভিন্ন ভিন্ন দেবতার এই শক্তিসমূহ একই পরমা শক্তির বিভূতি মাত্র। এক বৃক্ষ যেমন তার শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব, কাণ্ড-মূল প্রভৃতির সাহায্যে নিজেকে পরিপুষ্ট করে, আবার তার প্রাণশক্তি দিয়ে এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে এবং এগুলোকে বাদ দিয়ে যেমন বৃক্ষের আলাদা কোনো সত্তা কল্পনা করা যায় না, তেমনি বহু দেবতার মূল প্রাণশক্তি এক পরব্রহ্মের মধ্যেই নিহিত এবং এই পরব্রহ্মের অনন্ত বিভূতির সম্যক প্রকাশ এই বহুদেবতার মধ্য দিয়ে।

পরমেশ্বরের অসীম গুণরাজির ভিন্ন ভিন্ন বহিঃপ্রকাশ এই দেবগণের নিকট মানুষের ঋণ অপরিসীম। পরব্রহ্মের অনন্ত শক্তি ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে ক্রিয়াশীল থেকে মানব জীবনকে পরিচালিত করছে। তাই এসব দেবতার ঋণ স্বীকার করে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ আরাধনা করা বিধেয়। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবগণকে প্রত্যহ পরিতৃপ্ত করাই দেবযজ্ঞ। বৈদিক যুগ হতে আর্যঋষিগণ কর্তৃক প্রচলিত দেবযজ্ঞ ঋষিপরম্পরায় অদ্যাবধি সনাতনী জীবনব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে- "যদ্ অগ্নৌ জুহোত্যপি সমিধং তদ্ দেবযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে" (২/১০)। অর্থাৎ, অগ্নিতে সমিধ্ আহুতি দিলে দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। যজুর্বেদে বলা হয়েছে,

সমিধাগ্নিং দুবষ্যত ঘৃতৈর্বোধয়াতিথিম্।
অস্মিন্ হব্যা জুহোতন॥ (৩/১)

অর্থাৎ- হে মনুষ্য! ঘৃতাদি শুদ্ধ দ্রব্যের সহিত কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। এই অগ্নিতে পুষ্টি মধুর-সুগন্ধি রোগনাশক পদার্থের বিশেষভাবে আহুতি প্রদান কর। এই দেববজ্ঞ বা অগ্নিহোত্র পালন কর।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সকল মানবকে সম্বোধন করে বলেছেন-

দেবান্ ভাবয়তাঽনেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ (৩/১১)

অর্থাৎ- তোমরা যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে সম্বর্ধনা কর, দেবগণও তোমাদিগকে সম্বর্ধিত করুন। এইরূপে পরস্পরের সম্বর্ধনাদ্বারা পরস্পর মঙ্গললাভ করিবে।

সূর্য আমাদেরকে কিরণ দান করে, চন্দ্র জ্যোৎস্না বিতরণ করে, বৃষ্টির ধারা ধরণীকে রসসিক্ত করে, বায়ু জীবের প্রাণশক্তি সঞ্চালন করে, ধরণী ফসলাদি বিভিন্ন আহার্য উৎপাদন করে। এভাবে মহাপ্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপ দেবতারা আলো, বাতাস, জল, বায়ু, আহার্য প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য উপাদানসমূহ সরবরাহের মাধ্যমে জীবের জীবনযাত্রাকে সচল রেখেছে। তাই দেবতাদের কল্যাণে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি শুধুমাত্র ভোগের নিমিত্ত ব্যয়

না করে এর কিছু অংশ দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা অর্থাৎ দেবদত্ত দ্রব্যাদির দ্বারা দেবযজ্ঞ সম্পাদন করা বিধেয়। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥ (৩/১২)

অর্থাৎ- যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু প্রদান করবেন। সুতরাং দেবতাদের দেওয়া বস্তু দেবতাদের নিবেদন না করে যিনি ভোগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই চোর।

সুতরাং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণকে প্রত্যহ পরিতৃপ্ত করা আবশ্যক। দেবসেবাদ্বারা মানুষের চিত্তদেহাদি বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়, ক্রমশ মানুষের অন্তরে সত্ত্বগুণের পরিস্ফুরণ হয়ে দেবভাব আবির্ভূত হয় এবং কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে ক্রিয়াশীল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি জন্মে।

পিতৃযজ্ঞ: পিতৃযজ্ঞ হল পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞ। পিতৃযজ্ঞ দ্বিবিধ- শ্রাদ্ধ ও তর্পণ। পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে যথোপচারে নির্দিষ্ট সময় পর পর যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে শ্রাদ্ধ বলে। এই শ্রাদ্ধকর্ম মাসিক কিংবা বার্ষিক অনুষ্ঠিত হয়। পরলোকগত পিতৃপুরুষের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় কৃত কর্মানুষ্ঠান হল তর্পণ। অর্থাৎ, পার্থিব শরীর ত্যাগ করে পিতৃপুরুষের আত্মা পরলোকে গমন করলে তাঁদের উদ্দেশ্যে উত্তরসূরী কর্তৃক শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে প্রত্যহ জল-তিলাদি উৎসর্গ করাকে তর্পণ বলে।

পিতৃপুরুষের বংশ পরম্পরায় মানুষ এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করে থাকে। পিতামাতা শুধুমাত্র আমাদেরকে জন্মদান করেন না, স্নেহ, মায়া ও পরম মমতায় তাঁরা আমাদেরকে লালন পালন করে থাকেন। তাই মনুষ্যজন্ম লাভ ও পৃথিবীতে এই মানব শরীর ধারণে পিতামাতার ঋণ কখনো শোধ করার নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সেই ঋণ স্বীকারার্থে জীবিতাবস্থায় পিতামাতাকে যথাযথ সেবাপ্রদান এবং পরলোক গমন করলে তাঁদের ঔর্দ্ধদৈহিক প্রেতকৃত্য যথাবিধি সমাপন করে তাঁদের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ তর্পণ করা প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য। প্রতিদিন স্নানান্তে পবিত্র মনে পরলোকস্থিত পিতৃপুরুষকে স্মরণ এবং তাঁদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্বক জলাঞ্জলি প্রদান করাই পিতৃযজ্ঞ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে- "যৎপিতৃভ্যঃ স্বধা করোত্যপস্তৎ পিতৃযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে।" (২/১০) অর্থাৎ- পিতৃগণের উদ্দেশ্যে স্বধা মন্ত্রে জল প্রদান করলে পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। যজুর্বেদে বলা হয়েছে-

ঊর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতম্।
স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্। (২/৩৪)

অর্থাৎ- আমরা প্রত্যেকে জীবিত মাতা পিতা, গুরু জন ও বিদ্বান্ পুরুষদিগকে উত্তম রস, সুস্বাদু জল, সুমিষ্ট রোগ নাশক পদার্থ, ঘৃত, দুগ্ধ, সুরন্ধিত অন্ন ও সুপক্ক রসাল ফল দ্বারা তৃপ্ত করিব। পরধনে লোভ না করিয়া নিজধনে তৃপ্ত থাকিব।

পুনর্জন্মবাদ সনাতন ধর্মের মূল স্তম্ভ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে- "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" (২/২৭)। অর্থাৎ- যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাঁদের মোক্ষলাভ হয় তাঁদের জন্মমৃত্যুর আবর্তে পতিত হতে হয় না। এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন-

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (৮/১৬)

অর্থাৎ- হে অর্জুন! এই ভুবন থেকে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ পুনর্জন্মপ্রাপ্ত। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

সুতরাং জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি না হলে পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে আত্মা কোনো বিশেষ দেহ প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহের মাধ্যমে কিছুকাল জড় জগতে অবস্থান করার পর দেহের বিনাশ হয় তথা জীবাত্মা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর জীবের সূক্ষ্ম বা কারণ-শরীরের বিনাশ হয় না, কেবল স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরেরই ধ্বংস হয়। এই সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক দেহের নাম আতিবাহিক দেহ (দেবেন্দ্রবিজয় ৪৭৪)। এই আতিবাহিক দেহে জাগতিক কামনা-বাসনা ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি থাকে কিন্তু তা গ্রহণ করার সক্ষমতা থাকে না। এ অবস্থায় ইহজগতের কোনো পুত্রাদি প্রিয়জন যদি তাঁদের স্মরণে জলধারার সঙ্গে তার প্রিয় বস্তু শ্রদ্ধার সাথে উৎসর্গ করে, তাহলে সেই সূক্ষ্ম দেহ পরিতৃপ্ত হয়। তাই পিতৃপুরুষের ঋণ স্বীকারার্থে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সাথে প্রত্যহ তর্পণ ক্রিয়ার মাধ্যমে পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সকলের বিধেয়। পিতামাতার ঋণ সন্তানের পক্ষে কখনো শোধ করা সম্ভব নয়। তথাপি আর্যঋষিগণ পরলোকস্থিত পিতামাতার প্রতি আমৃত্যু ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপায়স্বরূপ তাঁদেরকে প্রত্যহ স্মরণপূর্বক জলাঞ্জলি প্রদানের যে বিধান রেখে গেছেন, এতে করে প্রত্যেক সনাতনীকে পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতারূপ মহাপাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়া থেকে পরিত্রাণের উপায় নির্দেশ করে গেছেন।

ভূতযজ্ঞ: 'ভূত' অর্থ প্রাণি। প্রাণিবর্গের আহারের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ নিবেদিত দ্রব্যাদি ত্যাগরূপ যজ্ঞই ভূতযজ্ঞ। মানুষের চারপাশে ঘিরে আছে জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের সমন্বয়ে বিশাল এক প্রাণের জগৎ। এই প্রাণের জগৎ অর্থাৎ ভূতাদি জগত এবং মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষ এই ভূতাদির দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। মানুষ তাই এদের নিকট অশেষভাবে ঋণী। তাই এই ঋণ হতে পরিত্রাণের জন্য জগতের দৃষ্ট-অদৃষ্ট, স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত রকম প্রাণীকুল হতে শুরু করে বৃক্ষরাজি প্রভৃতির প্রতিনিয়ত সেবা ও পরিচর্যা করা মানুষের অন্যতম কর্তব্য।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণ সর্বতোভাবে সমদর্শী ও উদার ছিলেন। স্বোদর ও স্বার্থ পরিতৃপ্তিকে চিরকাল তাঁরা হীন বলে মনে করতেন। তাঁরা প্রাণীবর্গের সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারতেন। তাঁরা উপলব্ধি করতেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর মধ্যে একই ইষ্টদেবতার প্রাণশক্তি বিদ্যমান। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র পরিব্যপ্ত রয়েছেন, তিনি ভূতাদি কাল এবং স্বরাদি লোকত্রয় ধারণ করে আছেন। তিনি অনন্ত ও অন্তবান, তিনি বিশ্বরূপ ধারণপূর্বক প্রাণীবর্গের অভ্যন্তরে অদৃশ্যভাবে বিরাজমান। এ প্রসঙ্গে অথর্বসংহিতায় বলা হয়েছে-

যো ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ, সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্যস্য চ কেবলং, তস্মৈ জেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥
স্কম্ভে নেমে বিষ্টভিতে, দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ তিষ্ঠতঃ।
স্কম্ভ ইদং সর্ব্বমাত্মন্বৎ, যৎ প্রাণৎ নিমিষচ্চ যৎ॥ (১০/৮/১-২)

তাঁরা বিশ্বাস করতেন সর্বদেহধারী প্রাণীবর্গের মধ্যেই একই পরমাত্মা বিরাজিত। তাই সর্ববিধ প্রাণিবর্গকে আহার্য বস্তু প্রদান ও যথোচিত সৎকারের দ্বারা পরিতুষ্ট করার মাধ্যমে পরমেশ্বরেরই সন্তুষ্টি বিধান করতেন আর্যঋষিগণ। এ কারণে তাঁরা স্ব স্ব আহার্য বস্তুর কিছু অংশ ভূতবর্গের ক্ষুদনিবারণার্থে নিয়োগ করে ভূতযজ্ঞের বিধান করে গেছেন। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে-

প্রজাভ্যঃ পুষ্টিং বিভজন্ত আসতে রয়িমিব পৃষ্ঠং প্রভবন্তমায়তে।
অসিন্বন্দংষ্ট্রৈঃ পিতুরত্তি ভোজনং যস্তাকৃণোঃ প্রথমং সাস্যুক্থ্যঃ। (২/১৩/৪)

অর্থাৎ- গৃহাগত সৎ পুরুষের জন্য ধারক ও পোষকধনকে গৃহস্থ যেমন ভাগ করে দেন, পুত্র পিতৃগৃহে যেমন ভোজন করে তেমনই হে ভগবন্! গৃহমেধী ভক্তেরা ভগবান প্রদত্ত পোষকধনকে প্রজাদের মধ্যে সমবণ্টন করে নিজ গৃহে সুখে বাস করেন। যিনি এই সুখকর কর্মের বিধান করেছেন তিনিই আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা।

বৈদিক যুগ হতে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অংশ হিসেবে সনাতনী সমাজে এ ভূতযজ্ঞের বিধান চলে আসছে। আর্যঋষিদের নিকট প্রতিটি জীবই ছিল কাছে সমান গুরুত্বসম্পন্ন। চিত্ত তাঁদের উচ্চ-নীচ ভেদশুন্য হওয়ায় মনুষ্য থেকে শুরু করে যাবতীয় ইতর প্রানীর মধ্যে তাঁরা প্রভেদ কল্পনা করতেন না। বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে তাঁরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। সর্বভূতেই যে ব্রহ্ম বিরাজমান তা উপনিষদে ধ্বণিত হয়েছে-

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজগুপ্সতে॥ (ঈশোপনিষদ, ৬)

অর্থাৎ- যিনি সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণীমাত্রকে সেই পরমাত্মাতেই স্থিত দর্শন করেন এবং সমস্ত ভূতে অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেই অবস্থিত সেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি তখন কোনো প্রাণীকেই ঘৃণা করেন না। প্রকাশমান বিশ্বের যে কোনো জীবসত্তার এভাবে সেবা করার নামই ভূতযজ্ঞ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে- "যদ্ ভূতেভ্যো বলিং হরতি তদ্ ভূতযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে" (২/১০)। অর্থাৎ- ভূতগণের তথা প্রাণীকুলের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান অর্থাৎ আহার্য দ্রব্যাদি উৎসর্গ করলে ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। শংকরাচার্যের মতে- "জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" অর্থাৎ- জীবই ব্রহ্ম, অপর কিছু নয়। এ কারণে সনাতনী ঋষি ও সাধু-মহাত্মাগণ মনুষ্য থেকে শুরু করে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি প্রভৃতি প্রাণীজগৎ ও বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদি উদ্ভিদজগত -সমস্ত ভূতাদিতে পরমাত্মার উপলব্ধিহেতু এবং জগদ্ব্যবস্থায় এসব ভূতাদির উপকার তথা ঋণ স্বীকারার্থে প্রত্যহ এদের উদ্দেশ্যে আহার্য দ্রব্য প্রদান অথবা অন্য কোনো উপায়ে এদের সেবা করা তথা ভূতযজ্ঞ সম্পাদন করার বিধান রেখেছেন।

অতিথিযজ্ঞ বা নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ: যাঁর আগমনের কোনো তিথি বা নির্ধারিত ক্ষণ থাকে না অর্থাৎ যিনি অকস্মাৎ গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হন, তাঁকে অতিথি বলা হয়। এই অতিথিদের যথোচিত সৎকার এবং জগতের যে কোনো প্রকার দুর্গত মানুষকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করাই অতিথিযজ্ঞ বা নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে- "যদ্ ব্রাহ্মণেভ্যোঽন্নং দদাতি তন্মনুষ্যযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে" (২/১০)। অর্থাৎ- কমপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করলে মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। মানুষ একাকী জগতে বাস করতে পারে না। কোনো না কোনো ভাবে সে প্রতিবেশী, সমাজ অথবা দেশ কিংবা সমগ্র বিশ্বের মানবকুলের দ্বারা প্রতিনিয়ত উপকার লাভ করে থাকেন। তাই মানুষের এ ঋণ শোধ করার জন্য প্রত্যহ মানবসেবায় আত্মনিয়োজিত থাকা প্রতিটি মানুষের উচিৎ। সময়ে হোক বা অসময়ে হোক, গৃহে কোনো অতিথির আগমন ঘটলে নিজের আহার্য দ্রব্য সেই অতিথিকে দিয়ে হলেও তাঁর সেবা করা বিধেয়। বৈদিক ঋষিগণ অতিথিসেবাকে কতটুকু গুরুত্ব দিতেন এবং তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় তার কিরূপ অপরিহার্যতা ছিল তা বেদশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। অথর্ববেদে (৯/৬/৩/১-৯) অতিথিযজ্ঞ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

ইষ্টং চ বা এষ পূর্তং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি॥
পয়শ্চ বা এষ রসং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি॥
ঊর্জাং চ বা এষ স্ফাতিং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি॥
প্রজাং চ বা এষ পশূংশ্চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি॥
কীর্ত্তিং চ বা এষ যশশ্চ চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি॥
শ্রিয়ং চ বা এষ সংবিদং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি॥
এষ বা অতিথির্যচ্ছ্রোত্রিয়স্তস্মাৎ পূর্ব্বো নাশ্নীয়াৎ॥

অশিতাবতিথাবশ্নীয়াদ্ যজ্ঞস্য সাত্মত্বায় যজ্ঞস্যাবিচ্ছেদায় তৎ ব্রতম্॥
এতদ্বা উ স্বাদীয়ো যদধিগবং ক্ষীরং বা মাংসং বা তদেব নাশ্নীয়াৎ॥

অর্থাৎ- যে গৃহস্থ অতিথির পূর্বে ভোজন করেন, তিনি গৃহের ইষ্টসুখ, পূর্ণতা, পরাক্রম, বৃদ্ধি, কীর্তি, যশ, শ্রী এবং জ্ঞান ভোজন করেন। বেদজ্ঞানী মাত্রই অতিথি। সুতরাং অতিথির পূর্বে ভোজন করা অনুচিত। অতিথির ভোজন করার পরে গৃহস্থ ভোজন করবে। যজ্ঞের অনুভূতি এবং যজ্ঞের নিরন্তর প্রবৃত্তির জন্য এটাই নিয়ম। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে-

অদত্ত্বা তু য এতেভ্যঃ পূর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
স ভুঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ॥
ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈব হি।
ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতি॥ (৩/১১৫-১১৬)

অর্থাৎ- যে অজ্ঞ ব্যক্তি অতিথি ও ভৃত্য প্রভৃতিকে অন্ন না দিয়ে নিজেই ভোজন করে, সে জানে না যে, সে মারা গেলে শকুনি-কুকুরেরা তার দেহ ভক্ষণ করবে। প্রথমে ব্রাহ্মণ-অতিথি ও দাসদাসী ভোজন করবে, পরিশেষে অবশিষ্ট যা কিছু থাকবে, গৃহস্থ সপত্নীক তা ভোজন করবে। সনাতন ধর্মশাস্ত্রসমূহে এভাবে অতিথি ও মনুষ্যসেবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই অতিথিসেবার পাশাপাশি প্রত্যহ কোনো না কোনো উপায়ে মনুষ্যসেবা করাও সকলের উচিত। নির্বিশেষে ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, গৃহহীনকে আশ্রয়দান, শারিরীক পীড়াগ্রস্থ মানুষকে সেবাদান প্রভৃতির মাধ্যমে এ মনুষ্যযজ্ঞ সম্পাদন করা যায়। সর্বদেবময় অতিথি ও মনুষ্য পূজনে ইহকালে যেমন যশোলাভ হয়, তেমনি পরকালেও সুকৃতিজনিত স্বর্গলাভ বা মোক্ষলাভ ঘটে থাকে।

ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ: বেদশাস্ত্রের অধ্যয়ন অর্থাৎ স্বাধ্যায় এবং অপরকে অধ্যয়ন করানোই ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ। আর্যঋষিগণ যে অসীম অধ্যাত্ম জ্ঞানের ভাণ্ডার বেদশাস্ত্র এবং বেদানুকুল অপরাপর শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে সঞ্চিত রেখে গেছেন, প্রত্যেকের উচিত ঋষিযজ্ঞরূপ ক্রিয়ার মাধ্যমে সেই পরম জ্ঞান আত্মস্থ করা, সেই জ্ঞান প্রত্যহ চর্চা করা এবং সর্বসাধারণের মধ্যে নিয়ত সেই জ্ঞানের দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়া। সনাতন ধর্ম ঋষিশাসিত ধর্ম এবং এ ধর্মের বিধি-বিধান ঋষিদর্শিত জ্ঞানের আকর বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থেই নিহিত। এসব শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বারাই মানবমন পার্থিব বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্বক সেই অনন্ত শক্তিমান পরব্রহ্মে লীন হতে পারে। এজন্য এর নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। তাই সনাতনী চেতনায় উদ্ভাসিত প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন এই বেদশাস্ত্রের আংশিক হলেও অধ্যয়ন ও পাশাপাশি অধীত বিদ্যা অপরকে শেখানোর প্রয়াস করা উচিৎ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে- "যৎ স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ীতৈকামপ্যৃচং যজুঃ সাম বা তদ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"(২/১০)। অর্থাৎ- স্বাধ্যায় বা বেদ অধ্যয়ন করলে, অন্তত একটি ঋক্, একটি যজু বা একটি সাম অধ্যয়ন করলে ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়।

বৈদিক ঋষিগণই সনাতনী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরা যে বেদবিদ্যা দর্শন করেছেন, সেই বেদবিদ্যাই এ সমাজের প্রাণ। এ বেদশাস্ত্র ছাড়াও যুগে যুগে সনাতনী ভাবধারার বহু ধর্মশাস্ত্র ঋষিগণ কর্তৃক রচিত হয়েছে। তাই বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেকের উচিত ঋষিপরম্পরা প্রাপ্ত সেই শাস্ত্রগ্রন্থাদি হতে অধীত বিদ্যা হৃদয়ে লালন করা, প্রত্যহ চর্চা করা এবং অপরের নিকট সেই বিদ্যা পৌঁছে দেয়া। ঋগ্বেদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ।
গায় গায়ত্রমুক্থ্যম্॥ (১/৩৮/১৪)

অর্থাৎ- মুখে শ্লোক রচনা করা, পর্জন্যের ন্যায় তা বিস্তার করা; উকথস্তুতি বিশিষ্ট গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত (সূক্ত) পাঠ করা উচিত। অর্থাৎ- প্রত্যেক মানুষকেই বেদমন্ত্র কণ্ঠস্থ করে তা থেকে আহরিত ও সঞ্চিত জ্ঞান অন্যদের নিকট

প্রচার করা উচিত। এভাবে বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের দ্বারা যে অপৌরুষেয় বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হওয়া গেছে, তা রক্ষা করা বেদপন্থী প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। আর সে দায়িত্ব পালনার্থে প্রত্যহ বেদশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আবশ্যক। বেদশাস্ত্রাদির যে শাখা পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হয়ে আসছে, প্রত্যহ সেই বেদশাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ব্রহ্মযজ্ঞ।

স্বকীয় বেদশাখা অধ্যয়নের নামই স্বাধ্যায়। যজ্ঞ সম্পাদনে বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই স্বাধ্যায় বা ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদনে এরূপ কোনো দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় না। এ প্রসঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণে (১১/৫/৬/৩) বলা হয়েছে-

> অথ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। তস্য বৈ এতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য বাগেব জুহূ, র্মন উপভৃৎ, চক্ষু র্ধ্রুবা, মেধা শ্রুবঃ, সত্যং অবভৃথঃ, স্বর্গো লোকঃ উদয়নং। যাবন্তং হ বৈ ইমাঙ পৃথিবীং বিত্তেন পূর্ণাং দদং, লোকং জয়তি ত্রিস্তাবন্তং, জয়তি ভূরাংসং চ অক্ষয্যং, -য এবং বিদ্বানহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।

"এই যে ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যই এই যজ্ঞের জুহূ, মন এর উপভৃৎ, চক্ষু এর ধ্রুবা, মেধা এর শ্রুব, সত্যই এর অবভৃথ স্নান, স্বর্গলোক এর উদয়ন বা সমাপ্তি। যিনি ব্রহ্মযজ্ঞের বিষয় এরূপে সম্যক অবগত হয়ে স্বকীয় শাখায় প্রচলিত বেদ প্রত্যহ অধ্যয়ন করেন, তিনি ধন পূর্ণা মেদিনীমণ্ডল প্রদাতা অপেক্ষা তিন গুণ অবিনশ্বর লোক লাভের অধিকারী হন।" ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের মন্ত্র অধ্যয়নে কিরূপ আহুতির ফল লাভ করা যায় এবং ভক্তিপুতহৃদয়ে এসব শাস্ত্রাদির স্বাধ্যায়ের ফলস্বরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্বক জীবাত্মার পরব্রহ্মে লীন হওয়ার বিষয়েও বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে,

> পয়াহুতয়ো হ বৈ এতা দেবানাং, যদ্ ঋচঃ। স য এবং বিদ্বান্ ঋচোঽহরহঃ স্বাধ্যায়ং অধীতে, পয়াহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তর্পয়তি। ত এণং তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ প্রাণেন রেতসা সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বাভিঃ পুণ্যাভিঃ সম্পদ্ভিঃ ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যাঃ পিতৄন্ স্বধা অভিবহন্তি।
>
> আজ্যাহুতয়ো হবৈ এতো দেবানাং যদ্ যজূংষি। স য এবং বিদ্বান্ যজুংষ্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে, আজ্যাহতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তর্পয়তি। তে এণং তৃপ্তা স্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ ইত্যাদি।
>
> সোমাহুতয়ো হ বৈ এতা দেবানাং যৎ সামানি। স য এবং বিদ্বান সামানি, অহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে, সোমাহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তর্পয়তি। ইত্যাদি।
>
> মেদাহুতয়ো হ বৈ এতা দেবানাং যৎ অথর্বাঙ্গিরসঃ। স য এবং বিদ্বান্ অথর্বাঙ্গিরসো, অহরহ স্বাধ্যায়মধীতে, মেদাহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তর্পয়তি। ইত্যাদি।
>
> মধ্বাহুতয়ো হ বৈ এতা দেবানাং, যদ্ অনুশাসনানি, বিদ্যা, বাকোবাক্যং, ইতিহাসঃ, পুরাণং, গাথা, নারাশংস্যঃ। স যঃ এবং বিদ্বান্ ইত্যাদি।
>
> তস্য বৈ এতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য চত্বারো বষট্কারাঃ যদ্ বাতো বাতি, যদ্ বিদ্যোততে, যৎ স্তনয়তি, যদ্ অবস্ফূর্জ্জতি ন অধীয়ীত এব বষট্কারাণাং অচ্ছন্বষটকারায়,। অতি হ বৈ পুনর্মৃত্যুং মুচ্যতে, গচ্ছতি ব্রাহ্মণঃ সাত্মতাম্। স চেদপি প্রবলমিব ন শক্নুয়াদপ্যেকং দেবপদং অধীয়ীত এব। তথা ভূতেভ্যো ন হীয়তে। (১১/৫/৬/৪-৯)

"প্রতিদিন ঋগবেদীয় ঋগধ্যয়নে দেবতাগণের উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতির ফল পাওয়া যায়। ঋগধ্যয়নরূপ ঘৃতাহুতি দ্বারা যিনি প্রত্যহ দেবতাগণের পরিতুষ্টি বিধান করেন, তিনি দেবগণের আশীর্বাদবলে বীর্যবান, পুণ্যাত্মা, ধর্মশীল, ধনশালী ও নিরোগী হয়ে থাকেন। স্বধামন্ত্রে ঘৃত-মধু সলিলাদি পিতৃলোকগণের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ প্রদান করলে পিতৃলোক যেমন তুষ্ট হন, সেই রূপ স্বশাখা প্রচলিত ঋগ্বেদ অধ্যয়নে তাঁরা পরিতুষ্টি লাভ করেন সন্দেহ নেই।

এইরূপ যজুর্বেদ অধ্যয়নে ঘৃতাহুতির, সামবেদ অধ্যয়নে সোমরসপূর্ণ আহুতির এবং অথর্বাঙ্গিরস বেদ অধ্যয়নে মেদাহুতির ফল লাভ হয়। এতে করে দেবগণ ও পিতৃগণ সকলেই সন্তুষ্ট থাকিয়া আশীর্বাদ করেন। ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাঁথা ও স্তুতি প্রতিদিন রীতিমত অধ্যয়ন দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে মধুদ্বারা প্রদত্ত আহুতির ফল লাভ হয়। তাঁর প্রতি দেবলোক ও পিতৃলোক সদা সন্তুষ্ট থেকে তাঁর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ বিধান করেন। ব্রহ্মযজ্ঞের চতুর্বিধ বষট্‌কার বা নিবৃত্তি। ঝড়ের কালে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকলে, বিদ্যুৎ দৃষ্ট হলে, মেঘগর্জন ও বজ্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হলে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। যিনি এ সকল বিষয় সম্যকরূপে অবগত হয়ে প্রত্যহ বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্বক পরব্রহ্মে বিলীন হন। সমগ্র বেদ অধ্যয়নে অসমর্থ ব্যক্তি একটি দেবস্তুতি অধ্যয়ন করলেও পরকালে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়।"

এভাবেই শতপথ ব্রাহ্মণের উল্লেখিত মন্ত্রসমূহে প্রত্যহ ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের মন্ত্র অধ্যয়নের ফল অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। শুধুমাত্র বেদশাস্ত্র নয়, এসব অধ্যয়নের পাশাপাশি অপরাপর শাস্ত্রগ্রন্থাদি যেমন- ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাঁথা ও স্তুতি প্রভৃতিরও চর্চা করা উচিত। এসব শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মাধ্যমেই মানুষ একদিকে যেমন ঋষিঋণ শোধ করতে সক্ষম হন, অপরদিকে এই শাস্ত্রলব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের ফলে অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন সংসার হতে পরিত্রাণপূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করতে সক্ষম হন। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে- ব্রহ্মযজ্ঞের দ্বারা জীবাত্মা অবিদ্যা ও অন্ধকার হতে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে পারে-

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি। (১/৬/১)

অর্থাৎ-বিদ্বানগণ ব্রহ্মযজ্ঞ বা উপাসনা যোগদ্বারা স্বীয় আত্মাকে মহান, হিংসারহিত, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত যুক্ত করেন। তাঁদের আত্মা অবিদ্যা, অন্ধকার হতে মুক্ত হয়ে জ্যোতির্ময় পরমাত্মার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। অতএব ঋষিঋণ শোধ এবং সেই সাথে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে একীভূতকরণের লক্ষ্যে বৈদিক যুগ থেকে আর্যঋষিগণ কর্তৃক প্রচলিত এ ব্রহ্মযজ্ঞ প্রত্যহ সম্পাদন করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

উপসংহার: বৈদিক ঋষিগণ দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করেছেন যে, একত্ব যেমন সত্য তেমনি বহুত্বও সত্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এর স্বপ্রকাশের রহস্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে বৈদিক ঋষিগণ এক ও অদ্বিতীয় সত্তাকেই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির উৎস হিসেবে অনুভব করেছেন। একই সাথে এই চরম সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, সৃষ্টির পূর্বেই যিনি জীবিত ছিলেন, স্থিতিশীল, গতিশীল, নিমিষবান, উড্ডীয়মান, চৈতন্যময় প্রাণীবর্গের এবং অচেতন পদার্থসমূহের একমাত্র স্রষ্টা ও নিয়ন্তা সেই দেবাদিদেব বিশ্বের সর্বত্র নিরন্তর বর্তমান আছেন। তাঁরই অলঙ্ঘ্য শাসন প্রভাবে সূর্য উদিত হয়, তাঁরই জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে বিশ্বভুবন প্রকাশিত করে এবং তাঁরই নির্দেশে অস্তমিত হয়,

যতঃ সূর্য্য উদেতি, অস্তং যত্র চ গচ্ছতি ।
তদেব মন্যে অহং জ্যেষ্ঠং, তদ্ উ নাত্যেতি কিঞ্চন॥ (অথর্ববেদ, ১০/৮/১৬)

এভাবে নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও নিয়ন্তার ভিন্ন ভিন্ন দেবশক্তিই মানুষকে যেমন নিয়ত পরিচালনা করছেন, তেমনি পরমাত্মার সৃষ্ট সমস্ত ভূতাদি মানুষের জীবনপ্রবাহে বিভিন্নভাবে উপকার সাধন করছেন। দৈবশক্তির পাশাপাশি বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে কালে কালে আবির্ভূত ঋষিকুল বেদাদি ও বেদানুকুল বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মাধ্যমে পরব্রহ্মের এই স্বরূপ ও সৃষ্টিরহস্য মানুষের সম্মুখে উন্মোচন করে মানুষকে সেই পরম সত্য, শিব ও সুন্দরের পথে চলতে নিয়ত সহায়তা করছেন। এভাবে মানুষ পরব্রহ্মের এই ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপ দেবগণ এবং পরম সত্যের পথপ্রদর্শক ঋষিগণের পাশাপাশি মনুষ্যাদি, ভূতাদি, জন্মদাতা পিতৃপুরুষাদির নিকট জন্মসূত্রে এবং জন্মের পরে

ঋণগ্রস্থ হয়েছেন যা থেকে মুক্তির পথ একমাত্র ঋষিনির্দেশিত বিধান পঞ্চ মহাযজ্ঞ। শুধুমাত্র পঞ্চঋণ শোধই এ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য নয়। আর্যঋষিগণ যে পরব্রহ্মের অংশভূত দেবতা থেকে শুরু করে মনুষ্যাদি, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদরাজি প্রভৃতির মধ্যেই পরমাত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করতেন তথা সর্বভূতে সমদর্শী ছিলেন, সর্বদা বিশ্বের সর্বভূতের শান্তি কামনায় ব্রতী ছিলেন পঞ্চ মহাযজ্ঞ তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যজুর্বেদের শান্তিমন্ত্র ঋষির বিশ্বশান্তি কামনার এরূপ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত,

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ
শান্তিরোষধয় শান্তি। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে
দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ শান্তিরেব
শান্তি সামা শান্তিরেধি॥ (৩৬/১৭)

"দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ লোক ও পৃথ্বীলোক শান্তিময় হোক। জল, ওষধি ও বনস্পতি শান্তিময় হোক। সকল দেবগণ, ব্রহ্ম এবং জগতের যা কিছু সবই শান্তিময় হোক। সর্বত্র শান্তি শান্তিময় হোক। সেই শান্তি আমি যেন প্রাপ্ত হই।" মন্ত্রটিতে ঋষি বিশ্বের সকল লোক যেন সুখে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, ত্রিলোকের সকল সৃষ্টিই যেন সর্বজন-কল্যাণময় হয় সেজন্য দেবতাদের নিকট উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, যার মর্মবাণীতে পঞ্চ মহাযজ্ঞতত্ত্বেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তাই শুধুমাত্র পার্থিব ঋণমুক্তির উপায়স্বরূপ নয়; সর্বভূতে সমদর্শী হয়ে বিশ্বজনীন মঙ্গল কামনার্থে, সর্বোপরি মানুষের মোক্ষপথকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে সনাতনী সমাজব্যবস্থায় আর্যঋষিগণ যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান প্রবর্তিত করে গেছেন, প্রত্যহ ভক্তিপুতহৃদয়ে তা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ ইহলোকে ঐশ্বর্যলাভ এবং পরলোকে পরব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হবেন।

তথ্যসূত্র

Ram, Tulsi, trans. *Rigveda.* Delhi: Vijaykumar Govindram Hasanand, 2013.
Ram, Tulsi, trans. *Yajurveda.* Delhi: Vijaykumar Govindram Hasanand, 2013.
Ram, Tulsi, trans. *Atharva-Veda.* Delhi: Vijaykumar Govindram Hasanand, 2013.
Sarma, Subramania, ed. *Taittirīya-Brāhmaṇa.* Chennai: 2005. E-book.
Taittiriya Samhita, sanskritdocuments.org, November 5, 2024. E-book.
ঘোষ, জগদীশচন্দ্র, সম্পাদিত। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। কলকাতা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ২০০৫।
ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত। *গীতা-ধ্যান (সমগ্র)*। ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা: মহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ২০০০।
ভট্টাচার্য্য, বিধুশেখর। *মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।
Taittiriya Aranyaka, sanskritdocuments.org, August 6, 2023. E-book.
তর্কভূষণ, প্রমথনাথ। *মনুসংহিতা*। কলকাতা: বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।
দত্ত, রমেশচন্দ্র। *ঋগ্বেদ সংহিতা* (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০০০।
গোস্বামী, শ্রীবিজনবিহারী, অনুদিত ও সম্পাদিত। *অথর্ববেদ*। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৮।
বসু, শ্রীদেবেন্দ্রবিজয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। পঞ্চম ভাগ, কলিকাতা: দীনবন্ধু লেন, ১৩২৩।
গম্ভীরানন্দ, স্বামী। *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী*। কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬২।
বিদ্যারত্ন, কালিপ্রসন্ন, অনুদিত। *বিবেকচুড়ামণিঃ*। কলিকাতা: বীডনষ্ট্রীট, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।